সমকাল

প্রকাশ : ১২ মার্চ, ২০১৪ ০০:০০:০০

বুকে বইছে পদ্মা মেঘনা যমুনা

প্রফেসর ড. গোলাম আবু জাকারিয়া। জার্মান প্রবাসী চিকিৎসা পদার্থবিদ। বাংলাদেশে চিকিৎসা পদার্থবিদ্যা প্রতিষ্ঠার অগ্রনায়ক। ক্যান্সার চিকিৎসায় রাখছেন অবদান। পাশাপাশি জার্মানিতে ছড়িয়ে দিচ্ছেন বাংলা সাহিত্য এবং সংস্কৃতি। এ অবদানের জন্য ২৭ ফেব্রুয়ারি পেয়েছেন 'বাংলা একাডেমি প্রবাসী লেখক পুরস্কার ২০১৩'। তার সম্পর্কে বিস্তারিত জানাচ্ছেন নাদিম মজিদ

গোলাম আবু জাকারিয়া

ইচ্ছে ছিল প্রকৌশলী হওয়ার। সেই বাসনায় ভর্তি হয়ে ছিলেন ঢাকায় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে। সবেমাত্র প্রথম বর্ষ_১৯৭১ সালের অগ্নিঝরা মার্চ। উত্তাল দেশ। তৎকালীন কায়েদে আজম অর্থৎ শহীদ তিতুমীর হলের আবাসিক ছাত্র ছিলেন। ২৫ মার্চ কালরাত্রির ভয়াবহ অভিজ্ঞতার পর আর সবার মতো তিনিও ধরলেন বাড়ির পথ। বাড়ি নওগাঁ জেলার বোয়ালিয়া ইউনিয়নের ইকরকুঁড়ি গ্রামে। গাড়ি চলছে না। তাই হেঁটেই শুরু হলো যাত্রা। নানা বিপর্যয়ের মধ্যে বগুড়ার নশরতপুরে পেঁৗছার পর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যায় পাকিস্তানি মিলিটারি। সবাইকে লাইনে দাঁড় করিয়ে ওরা গুলি চালানো শুরু করল। মৃত্যু নিশ্চিত। কিন্তু না_কী মনে করে পাকিস্তানি হানাদাররা তাকে ছেড়ে দেয়। বেঁচে যান আজকের চিকিৎসা

পদার্থবিদ গোলাম আবু জাকারিয়া ।

স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ দেখে বিভিন্ন দেশ এ দেশের ছাত্রদের শিক্ষাবৃত্তি দিচ্ছিল। জার্মানির হালে-ভিইটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যায় পড়ার সুযোগ মেলে। বলছিলেন জাকারিয়া_ ১৯৭২ সালে উড়াল দিই জার্মানিতে। আমরা ছিলাম স্বাধীনতা-উত্তর দেশের প্রথম দিককার শিক্ষাবৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র। উড়াল দেওয়ার আগে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্ররা সবাই মিলে দেখা করতে যাই বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে। বঙ্গবন্ধু বলেন, 'তোরা যেখানে যাস। মনে রাখিস, তোরা বাংলাদেশের গরিব মানুষের পয়সা দিয়ে এখানে পড়াশোনা করেছিস। তাদের ভুলিস না।' আমি সে কথা ভুলিনি। বিদেশ বিভুঁইয়ে থাকলেও আমার বুকে বয়ে চলে পদ্মা-মেঘনা-যমুনা। যখনই সুযোগ পাই চেষ্টা করি দেশের জন্য কিছু করার। বিদেশেও যেন দেশের মুখ উজ্জ্বল হয় সব কাজে থাকে সেই চেষ্টা।_ একটু খিতু হয়ে আবার শুরু করলেন কথা।

জার্মানের লিপজিগে জার্মান ভাষায় কোর্স করার পরে ভর্তি হন হালে ভিইটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যায়। ১৯৭৮ সালে স্নাতক এবং ১৯৮০ সালে জার্মানির গটিঙ্গেইন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসা পদার্থবিদ্যায় স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। ১৯৮৬ সালে হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি অর্জন করেন।

পদার্থবিদ্যায় পড়লে পদার্থবিদ হওয়ার কথা। কেন চিকিৎসা পদার্থবিদ্যায় ঝুঁকলেন জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, দুটি কারণে আমি চিকিৎসা পদার্থবিদ্যাকে পড়ার বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছি। প্রথমত, তখন আমি সম্মান দ্বিতীয় বর্ষে পড়ি। জার্মানিতে একটি সেমিনারে 'মোলিকিউলার বায়োলজি'-এর জনক মার্ক্স ডব্লুবেক এলেন। সে সেমিনারে তিনি পদার্থবিদদের উদ্দেশ করে বলেন, এখন পদার্থবিদদের উচিত পরমাণু বোমা বাদ দিয়ে চিকিৎসা পদার্থবিদ্যায় আসা। তার বক্তব্য শুনে আমি চিকিৎসা পদার্থবিদ্যায় আসতে অনুপ্রাণিত হই।

দ্বিতীয়ত, ব্রিটেনের বার্মিংহাম শহরে থাকেন আমার মামা ড. গোলাম মোস্তফা। তিনিও প্রেরণা জোগান।

পড়াশোনা শেষে জার্মানিতে তিনি চিকিৎসা পদার্থবিদ্যায় কাজ করছিলেন। তার জার্মান এবং আন্তর্জাতিক ভাষায় লেখা প্রবন্ধ বিভিন্ন জার্নালে ছাপা হচ্ছে। কিন্তু ভুলে যাননি বাংলাদেশের কথা। বাংলাদেশের জন্য নিজ অঙ্গন থেকে কাজ করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগাযোগ শুরু করেন। উদ্দেশ্য, এখানে চিকিৎসা পদার্থবিদ্যা চালু করা। প্রতি বছর সেমিনার আয়োজন করা হলেও খুব বেশি সাড়া পাচ্ছিলেন না। আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় আটকে যাচ্ছিল উদ্যোগ। ১৯৯৯ সালে পরিচয় হয় গণবিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি ড. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর সঙ্গে। তিনি এ বিষয় চালু করতে সম্মত হন। তবে শর্ত দেন, সার্বিক দেখাশোনা তাকেই করতে হবে। তাতেই রাজি। শুরু হয় বাংলাদেশে চিকিৎসা পদার্থবিদ্যা বিষয়ে পড়াশোনা। প্রতি বছর তিনি ছুটে আসছেন এখানে পড়াতে। বছরে তিন থেকে চারবার আসেন। এখান থেকেই ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসা সেবায় প্রতি বছর যুক্ত হচ্ছেন নতুন নতুন চিকিৎসা পদার্থবিদ।

বাংলাদেশে এখন যেসব চিকিৎসা পদার্থবিদ কাজ করছেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তারা এখান থেকে পাস করেছে_ জানালেন ড. জাকারিয়া। তিনি বলেন, আমাদের দেশে এখনও চিকিৎসা পদার্থবিদ অপ্রতুল। দেশে যে পরিমাণ চাহিদা আছে, সে পরিমাণ চিকিৎসা পদার্থবিদ তৈরি হতে আরও অনেক সময় লাগবে।

তিনি জার্মান মেডিকেল ফিজিক্স সোসাইটির অধীনে 'উন্নয়নশীল বিশ্বে চিকিৎসা পদার্থবিদ্যা' নামে ওয়ার্কিং গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য (১৯৯৩) এবং বর্তমানে চেয়ারম্যান (২০১০)। বাংলাদেশ, তাঞ্জানিয়া এবং নিকারাগুয়াকে মডেল ধরে চালানো হচ্ছে এ গ্রুপের কাজ। তার মতে, বাংলাদেশেই এ সংগঠন বেশি সফল। কারণ হিসেবে বলেন, এখানে আমার শিকড় থাকায় প্রতি বছর কয়েকবার আসতে পারি।

দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে জার্মানিতে ১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশ স্টাডি অ্যান্ড ডেভেলপিং সেন্টার। প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাশাপাশি সংগঠনের সদস্য হিসেবে আছেন অনেক জার্মান নাগরিক। এ সংগঠন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেন, বাংলাদেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে উন্নয়ন করা, বিশেষ করে জার্মানি থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান বাংলাদেশে ছড়িয়ে দেওয়া। আরেকটি হলো, বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতিকে জার্মানদের কাছে পেঁৗছে দেওয়া। তার লেখা পদার্থ চিকিৎসা বিজ্ঞানবিষয়ক শতাধিক প্রবন্ধ প্রশংসিত হয়েছে আন্তর্জাতিক ভাবে।

দেশে এলে প্রতিবারই নিজের গ্রামে যান। গ্রামের বিভিন্নজন তাকে ধরেন এলাকায় একটি উচ্চবিদ্যালয় করে দিতে। এতে বাল্যবিয়ে কমবে। গ্রামের মানুষ শিক্ষিত হবে। গ্রামের দরিদ্র মানুষের কথা বিবেচনা করে ১৯৯৯ সালে নওগাঁয় প্রতিষ্ঠা করেন ইকরকুঁড়ি উচ্চ বিদ্যালয়। ২০০৯ সালে প্রতিষ্ঠা করেন মা ও শিশু স্বাস্থ্যকেন্দ্র। সেখানে গর্ভবতী মা ও শিশুদের চিকিৎসা দেওয়া হয়। আছে মোবাইল হেলথ ক্লিনিক। নওগাঁ সদরে রয়েছে ১৭টি ইউনিয়ন। প্রতি মাসে একটি ইউনিয়নে একবার যায় এ ক্লিনিক। ৫০ হাজারের বেশি মানুষ পাচ্ছে এ হাসপাতালের সুবিধা। এ প্রতিষ্ঠানের আরেকটি সুবিধা হলো, ব্যবহার করা হচ্ছে সৌরবিদ্যুৎ। এমনকি অপারেশনগুলোও হয় এই সৌরবিদ্যুৎ দিয়ে। এ ছাড়া ২০১১ সালে নওগাঁর পতিসরে রবীন্দ্র ভাস্কর্য স্থাপন করা হয়।

জার্মানিতে বাংলা ভাষাকে ছড়িয়ে দিতে ১৯৯৯ সালে জার্মান ভাষায় জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের গান ও কবিতার ওপর ভিত্তি করে সম্পাদনা করেন 'লাইফ অ্যান্ড ওয়ার্ক অব দ্য বেঙ্গলি পোয়েট কাজী নজরুল ইসলাম', বাংলা ভাষায় সম্পাদনা করেন ২০০১ সালে 'বিশ্বায়ন ও বাংলাদেশ', ২০০৬ সালে বেগম রোকেয়ার ওপর জার্মান ভাষায় লেখেন 'রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন_ অ্যা পোট্রেট অব অ্যা বেঙ্গলি ফিমেল হিউমিনিস্ট', ২০১১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওপর জার্মান ভাষায় রচনা করেন 'রবীন্দ্রনাথ ট্যাগর : ওয়ান্ডারার বিটুইন ওয়ার্ল্ডস'।

প্রফেসর গোলাম আবু জাকারিয়া ১৯৫৩ সালের ৩০ ডিসেম্বর নওগাঁ জেলার ইকরকুঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে জার্মানিতে বসবাস করছেন। তার এক ছেলে ও এক মেয়ে।

বাংলাদেশ সম্পর্কে তার বিপুল প্রত্যাশা। যখন জার্মানিতে কোনো বিষয় নিয়ে কাজ করেন, মন চায় তা যেন বাংলাদেশেও হোক। যখন জার্মানিতে যান তখন বাংলাদেশ ছিল অনেক অনুন্নত। এতদিনে দেশের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হলেও তুলনামূলকভাবে দেশ অনেক উন্নত হয়েছে। দেশের প্রতি প্রত্যাশার কথা জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি দেশের তরুণ প্রজন্মের প্রতি খুব বেশি আশাবাদী। তাদের মধ্যে কোনো বিষয় ছড়িয়ে দিতে পারলে সহজে সাফল্য আসবে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানিদের হাতে মারা গেলে বিকশিত হতো না এমন মানবসম্পদ। কিন্তু বেঁচে থেকে বাংলাদেশের জন্য কিছু করতে চেষ্টা করছেন নিরন্তর। তার স্বপ্ন, বাংলাদেশের কোনো মানুষ চিকিৎসার অভাবে ক্যান্সার রোগে মারা যাবে না। জ্ঞান-বিজ্ঞানে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে জন্মভূমি বাংলাদেশ।